# সাইবারক্রাইম : দেশে-বিদেশে

মো: ফেরদৌস হোসেন

মানবজাতির সূচনা থেকেই সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য মানুষ প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছে। আগুন ও চাকা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সভ্যতার যে জয়যাত্রা শুরু, তার গতিপথ আজও বহমান। সভ্যতার এই অগ্রযাত্রায় মানুষ যেমন সফল হয়েছে, তেমনি পড়েছে হয়েছে নানা সঙ্কটে। একুশ শতকে বিজ্ঞানের সেরা অবদান কমপিউটার। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে ইন্টারনেট ও সেল্যুলার ফোনের মাধ্যমে আমরা বিশ্বকে ঠিকই পেয়েছি হাতের মুঠোয়, তবে সাইবার-ক্রাইমের ভয়ঙ্কর থাবায় তথ্যপ্রযুক্তিতে আমাদের নৈতিকতা বার বার হোঁচট খাচ্ছে।

সাইবারক্রাইম শব্দবাচ্যটি তথ্যপ্রযুক্তি দুনিয়ার এক অশুভ থাবা। তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে কমপিউটার, ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যেকোনো আইন বা বিধি-বহির্ভূত কাজ কিংবা অবৈধ অনুপ্রবেশই হচ্ছে সাইবারক্রাইম। অনেকে এ অপরাধকে কমপিউটার-ক্রাইম বা হাইটেক ইলেকট্রনিক-ক্রাইম বলেও অভিহিত করে থাকেন। তথ্যপ্রযুক্তি-টাইকুন বিল গেটস থেকে শুরু করে সাধারণ কমপিউটার ব্যবহারকারী পর্যন্ত কেউই সাইবারক্রাইম আতঙ্কের বাইরে নেই। প্রচলিত সাইবারক্রাইমের মধ্যে রয়েছে- ফেসবুকে প্রতারণা, পাসওয়ার্ড চুরি, ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, পর্নোগ্রাফি বিশেষ করে শিশু পর্নোগ্রাফি, ব্ল্যাকমেইলিং, অনলাইনে জুয়া, মাদক ব্যবসায়, হুন্ডি ব্যবসায়, যৌন-নিপীড়ন, হ্যাকিং ক্র্যাকিং, ওয়েব জ্যাকিং মেইল, ফিশিং, ফার্মিং, স্প্যামিং ভাইরাস স্প্রেডিং ইত্যাদি।

সাইবারক্রাইমের শুরু নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। অনেকেই মত দিয়েছেন, প্রথমে প্রজন্মের কমপিউটার অ্যাবাকাস আবিষ্কারের পর থেকেই সাইবারক্রাইম শুরু। তবে এই তথ্যের পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। আবার অনেকে বলেছেন 'ক্যালকুলেটিং ডিভাইসের মাধ্যমে প্রথম এ ধরনের ক্রাইম শুরু হয়। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আধুনিক সাইবারক্রাইম শুরু হয় ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'ফোন ফ্রিকিং' তথা অবৈধভাবে ফোনের সিস্টেম কোড ভেঙে অনুপ্রবেশ করার মাধ্যমে। ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এমআইটিতে (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি) কমপিউটার বিজ্ঞানের যেসব ছাত্র দ্রুততার সাথে বিভিন্ন প্রোগ্রাম সমাধান করতে পারত, তাদের হ্যাকার নামে ডাকা হতো। তখন শব্দটি ইতিবাচক অর্থে ব্যবহার হতো।

***সাইবারক্রাইমের বিভাজন :*** সাইবারক্রাইমের অনেক বিভাজন রয়েছে। মূলত চার ভাগে এই ক্রাইমকে বিভাজন করা হয়ে থাকে।

*০১. ব্যক্তির বিরুদ্ধে :* এসব ক্রাইমের মধ্যে সাধারণত স্প্যামিং, ভাইরাস স্প্রেডিং, শিশু পর্নোগ্রাফি, যৌন নিপীড়ন, আপত্তিকর ছবি/ইমেজ পোস্ট, ব্ল্যাক মেইল ইত্যাদি।

*০২. প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সাইবারক্রাইম :* এসব সাইবারক্রাইম সাধারণত কোনো কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, সম্মিলিত সম্পদের বিরুদ্ধে হতে পারে, যেমন- ব্যাংক, বীমা, শেয়ারবাজার, অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

*০৩. সরকার বা দেশের বিরুদ্ধে :* কোনো দেশের সার্বভৌমত্ব বা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর বিরুদ্ধে সাধারণত এ ধরনের সাইবারক্রাইম হয়ে থাকে। যেমন- উইকিলিকসে ফাঁস করা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন তথ্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। যুক্তরাষ্ট্রের মতে এটা সাইবারক্রাইম।

*০৪. সমাজের বিরুদ্ধে সাইবারক্রাইম :* সমাজের ওপর নেতিবাচক বিবিপত্র/আর্টিকেল পাচার বা চুরি, গোপন ক্যামেরায় তোলা ছবি, অনলাইনে জুয়া ও নেশাপণ্য বিক্রি, ব্যাংকিং সফটওয়্যার হ্যাকিং বা ক্র্যাকিং ইত্যাদি।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, সাইবার-ক্রিমিনালরা কেনো এত দ্রুত বিস্তার লাভ করছে ভার্চুয়াল জগতে? কারণ, বর্তমানে সাইবারবিশ্বে প্রবেশ করা খুবই সহজ। ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। অন্যদিকে প্রচলিত অপরাধের ঝুঁকি বেশি। আসলে যারা হ্যাকার কিংবা ক্র্যাকার, তারা বিশেষ ধরনের জটিল কমপিউটিং প্রোগ্রাম কিংবা কোড আয়ত্ত করে থাকে, যাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। সাধারণ প্রোগ্রাম ব্যবহারকারীরা শুধু প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামিং চালিয়ে থাকে, যা খুবই সীমিত। আবার সাধারণ ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা জ্ঞানের দুর্বলতা বা প্রাথমিক মৌলিক তথ্য দুর্বল হওয়ার ফলেও সাইবারক্রাইম বিস্তার লাভ করছে। যেমন- ব্যক্তিগত মেইলের পাসওয়ার্ডটি শব্দের অক্ষর দিয়ে তৈরি করলে, মেইলটি যেকেউ ঘাঁটাঘাঁটি করে খুলতে পারবে। অনেক সময় দেখা যায়, সংরক্ষিত ডাটা হারিয়ে গেলে পূর্বের ডাটা রিকভার না করেই ব্যবহারকারীরা বিকল্প পথ খুঁজে নেয়। ফলে আগের ডাটা থেকে অপরাধীদের অপরাধ করতে উৎসাহ যোগায়। মুক্ত সফটওয়্যার যেমন তথ্যপ্রযুক্তিকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তেমনি কিছু অপরাধী এদিকে সাইবারক্রাইমে ব্যবহার করছে।

***সাইবার-ক্রিমিনালদের রকমফের :*** বয়স, আচরণ ও ক্রাইমের ধরন অনুযায়ী সাইবার-ক্রিমিনালদের ৫ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে : শিশু কিশোর-যাদের বয়স ১০ বছর থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা সাধারণত বয়ঃসন্ধিক্ষণ পার করে কোনো কিছু না বুঝেই নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে কিংবা প্রলোভনে পড়ে নিজের অজান্তেই সাইবারক্রাইমে জড়িয়ে পড়ে। এটা সাধারণত উন্নত বিশ্বের বেলায়ই বেশি দেখা যায়।

***ক্র্যাকার বা হ্যাকারস গোষ্ঠী :*** হ্যাকারস গোষ্ঠী সাধারণত দলগতভাবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবে হানা দিয়ে অপরাধ সংঘটিত করে। স্বাভাবিকভাবে এরা রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা নিয়ে কোনো দেশ বা প্রতিষ্ঠানের ওয়েব অচল করে দেয়। উদাহরণ টেনে বলা যায়, উইকিলিকসের জনক জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ গ্রেফতার হওয়ার পরপর বেনামী এক হ্যাকার গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি সরকারি ওয়েবসহ পেপাল ও আমাজনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাইট অচল করে দিয়েছিল।

***শৌখিন হ্যাকার বা ক্র্যাকার :*** পেশাগতভাবে এরা হ্যাকিং বা ক্র্যাকিংয়ের সাথে জড়িত নয়। নিজেদের বুদ্ধির দৌড় কতদূর, তা যাচাই করার জন্য বা শখের বসে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাইটে অনুপ্রবেশ করে। এক সময় এরাই বড় ধরনের সাইবার-ক্রিমিনালে রূপান্তর হয়।

***পেশাদার সাইবার-ক্রিমিনাল :*** এই ধরনের অপরাধীরা সাধারণত অর্থ হস্তগত করার জন্য সাইবার জগতে অপরাধ করে বেড়ায়। যেমন- ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি, ওয়েবসাইট রেপ্লি-কা তৈরি, জাঙ্ক মেইল ইত্যাদি।

এছাড়া অনেক সময় কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরিচ্যুত হয়ে আগের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন্য প্রতিষ্ঠানে অর্থের লোভে পাচার করে দেয়। এ ধরনের সাইবারক্রাইম সাধারণত কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিকভাবে হয়ে থাকে। এদেরকে ডিসকানেকটেড সাইবার-অপরাধী বলা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গত জুন ২০১০ সালে উত্তর কোরিয়ার একজন পরমাণু বিজ্ঞানী দক্ষিণ কোরিয়াকে নিজ দেশের পরমাণুপ্রযুক্তি পাচারে জড়িত ছিলেন।

## ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেভাবে সাইবারক্রাইম ঘটে

ভাইরাস : কমপিউটার ব্যবহারকারীদের বড় আতঙ্কের নাম ভাইরাস এটি মূলত একটি প্রোগ্রাম, যা অদৃশ্য থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমপিউটার থেকে কমপিউটারে ডাটা মারাত্মক ▶

ক্ষতিসাধন করে। ভাইরাস মূলত ইন্টারনেট, পেনড্রাইভ, ফ্লপি বা এক্সটারনাল ডিভাইস থেকে আক্রান্ত হয়। ভাইরাস রুখতে হলে অবশ্যই এন্টিভাইরাস ব্যবহার করতে হবে।

ওয়ার্ম : ওয়ার্ম এবং ভাইরাস প্রায় একই ধরনের, তবে ভাইরাস থেকেও এটি ভয়াবহ। লোকাল বা ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক থেকে এটি দ্রুতগতিতে পিসিতে আক্রমণ করে ফাইল পাচার বা গায়েব করে দেয়। ওয়ার্ম ঠেকানোর একমাত্র উপায় হলো ফায়ার ওয়াল ব্যবহার।

স্পাইওয়্যার : কমপিউটার-ক্রাইম আরেক আতঙ্ক হচ্ছে স্পাইওয়্যার। এর প্রধান উৎস ভুয়া ওয়েবসাইট। প্রতিদিনের জীবনে আমরা যেসব ওয়েবসাইট ব্রাউজ করি, ঠিক একই ধরনের ওয়েবের টুল ব্রাউজারে এসে কড়া নাড়বে। আর ভুল করে একবার ব্রাউজ করলেই প্রয়োজনীয় সব ডাটা, যেমন- ব্যাংকের গোপন কোড, বিভিন্ন পাসওয়ার্ড, মেইল অ্যাড্রেস ও ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করে সর্বনাশ ঘটাবে।

ফিশিং : ফিশিং হচ্ছে হ্যাকারদের নতুন কূটচাল। ইউজারদের বোকা বানিয়ে তথ্য সংগ্রহ কিংবা অর্থ সংগ্রহই এদের মূল উদ্দেশ্য। সাধারণত কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট হুবহু নকল করে মেইলে পাঠিয়ে দিয়ে ব্রাউজ করার অনুরোধ করবে। সম্প্রতি বাংলাদেশী ইন্টারনেট ইউজাররা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিভি প্রোগ্রামের হুবহু কিছু ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রতারিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ওয়েবপেজগুলো পুরোপুরি ভুয়া। সাধারণত পুরনো ব্যবহারকারীরাই ফিশিং রুখতে পারে।

পর্নোসাইট : সাইবারক্রাইম বিশেষজ্ঞদের মতে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সাইবারক্রাইম সংঘটিত হয় পর্নোসাইট বা পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে। আর পর্নোসাইট সবচেয়ে বেশি তৈরি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ২০১১ সালের প্রকাশিত ২০১০ সালের নর্টন সাইবারক্রাইম রিপোর্টে দেখা যায় দুই-তৃতীয়াংশ অ্যাডাল্ট ওয়েব ব্যবহারকারীরা নানাভাবে সাইবারক্রাইমের সাথে জড়িত।

উপরেলি-খিত আতঙ্ক ছাড়াও কুকি কীট, ট্রোজান, ফার্মিং, ফেইক আইডি, অনলাইনে মাদক/জুয়া, নেশাপণ্য বিক্রি, ফ্রড ই-মেইল, প্রতারণাপূর্ণ অনলাইনে ভুয়া ডিগ্রি দেয়া ইত্যাদি ক্রাইমের আওতায় পড়ে। উলি-খিত ক্রাইমগুলো বিশ্বব্যাপী হয়ে থাকে।

## দেশে দেশে সাইবারক্রাইম প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও কার্যকারিতা

সাইবারক্রাইম প্রতিরোধে বিভিন্ন দেশে কঠোর আইনী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। চীনে সবচেয়ে বেশি ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়। শতকরা ৩২ ভাগ চীনা ইন্টারনেট ব্যবহার করে। এজন্য এদেশে সবচেয়ে বেশি সাইবারক্রাইম সংঘটিত হয়। এক তথ্যে দেখা যায়, পৃথিবীর মোট ম্যালওয়্যারের ৫ শতাংশ উদ্ভব এ দেশটি। দেশটির ৮০ শতাংশ ইন্টারনেট ইউজারই কোনো না কোনোভাবে ভয়াবহ সাইবারক্রাইমের শিকার হয়। সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে ভেবে চীন সরকার ফেসবুক ব্যবহার বন্ধ করে দেয়। সাইবারক্রাইম প্রতিরোধে ১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর চীনের পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরো 'কমপিউটার ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টারনেট সিকিউরিটি' ও 'প্রটেকশন ও ম্যানেজমেন্ট রেগুলেশনস' নামে দুটি আইন পাস করে। চীনের তথ্যশিল্প মন্ত্রণালয় সাইবারক্রাইম আইনগুলো প্রতিনিয়ত সংস্কার করছে। এছাড়া সাইবারক্রাইম ঠেকানোর জন্য বিশেষ করে সার্বভৌমত্বে আঘাত হানতে পারে এমন কোনো অপচেষ্টা রোধ করার প্রয়াসে চীনা সাইটগুলোতে দুজন ভার্চুয়াল পুলিশ (১ জন মহিলা, ১ জন পুরুষ) ৩০ মিনিট পরপর তদারকি করে।

চীনের পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এখানে শতকরা ৭৮ ভাগ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। জানা যায়, ইন্টারনেটে সবচেয়ে ভয়াবহ ক্রাইম পর্নোগ্রাফি তথা শিশু পর্নোগ্রাফি এবং ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি সবচেয়ে বেশি হয় মার্কিন মুলুকে। যুক্তরাষ্ট্রের 'ইন্টারনেট ক্রাইম কমপ্লে-ইন সেন্টার'-এর তথ্যমতে, সাইবারক্রাইমে ২০০১ সালেই প্রায় ২ কোটি ডলারের মতো



আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যা ২০০৯ সালে দাঁড়ায় ৫৫ কোটি ৯৭ লাখ ডলারে। অভিযোগবিহীন ক্ষতির পরিমাণ আরো যে কত হবে তার হিসেবে নেই।

যতদূর জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম সাইবারক্রাইম আইন চালু হয় ১৯৮৬ সালে 'কমপিউটার ফ্রড অ্যান্ড এবিউস অ্যাক্ট ১৯৮৬' নামে। এ আইনের আওতায় ১৯৮৮ সালে রবার্ট মরিস নামে একজন হ্যাকারকে সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটারের কোড ভাঙার কারণে ৩ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার ডলার জরিমানাও করা হয়। এছাড়া আরো যেসব আইন প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে আছে : 'দি ডিজিটাল মিলেনিয়াম কপিরাইট অ্যাক্ট ১৯৯৮, ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রটেকশন অ্যান্ড কমপিউটার ইন্ট্রুশন প্রোগ্রাম-১৯৯৮, ডিলিটিং অন লাইন প্রিডেটরস অ্যাক্ট ২০০৬ এবং শিশু পর্নোগ্রাফি রোধ করার জন্য প্রণয়ন করা হয় চিলড্রেন্স অন লাইন প্রাইভেসি অ্যাক্ট। অতিসম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে ৭০টিরও বেশি ওয়েবসাইট বন্ধ করা হয়েছে অনুমোদনহীন তথ্য ডাউনলোড করে বিক্রির অপরাধে।

তথ্যপ্রযুক্তিতে উন্নত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম দেশ মালয়েশিয়ায় প্রায় দেড় দশক আগে প্রণীত হয়েছে 'ডিজিটাল সিগনেচার অ্যাক্ট-১৯৯৭'। এছাড়া সাইবারক্রাইম রোধ করার জন্য গঠন করা হয়েছে দি মালয়েশিয়ান কমপিউটার ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম। সাইবারক্রাইমের শিকার যেকেউ এখানে ৯৯৯-এ ফোন করে তার অভিযোগ জানাতে পারে। প্রতিবেশী দেশ ভারত সাইবারক্রাইম রোধে 'ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাক্ট' নামে প্রথম আইন করে ২০০০ সালে। এছাড়া অনেক রাজ্যেও রয়েছে আলাদা আলাদা আইন। সাইবারক্রাইম ঠেকাতে ভারতেও ভার্চুয়াল পুলিশ কাজ করছে। পশ্চিমবাংলা সরকারও কলকাতাতে সাইবার পুলিশ স্টেশন স্থাপনের কাজ শুরু করেছে। ভারত সরকারের সবচেয়ে দক্ষ সাইবার টিম কাজ করে 'মুম্বাই সাইবার ল্যাব'-এর অধীনে।

## প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ইউএনডিপির অর্থায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম তথা এটুআই চালু করেছে। লক্ষণীয়, বেশ কিছু কার্যক্রম দেশের তথ্যপ্রযুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে- ৬ জানুয়ারি ২০১০-এ ৬৪ জেলার ওয়েবসাইট উদ্বোধন, কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক স্থাপন, বিটিআরসির তত্ত্বাবধানে বেসরকারি মোবাইল কোম্পানির প্রসার, দ্রুতগতির ইন্টারনেট ওয়াইফাই, ডিজিটাল সিগনেচার সিস্টেম, আবেদনকারীদের জন্য ই-পুর্জি ব্যবস্থা, অনলাইনে ভর্তি ইত্যাদি। সন্দেহ নেই, উপরোলি-খিত বিষয়গুলো আমাদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করবে। কিন্তু মূল বিষয় হলো, তথ্যপ্রযুক্তির নিরাপত্তা বিধানে বা সাইবারক্রাইম ঠেকাতে আমরা কতটুকু প্রস্তুত? যেখানে সরকারি ওয়েবসাইট হ্যাকিং বা খোদ প্রধানমন্ত্রীকে ই-মেইলে হুমকি দেয়া হয়। মোট কথা আমাদের ডিজিটালাইজেশন তখনই সার্থক হবে, যখন পুরো ডিজিটাল ব্যবস্থাকে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হবো।

২০০২ সালে সরকার জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি নীতিমালা-২০০২ প্রণয়ন করে এবং প্রণীত হয় তথ্যপ্রযুক্তির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আইসিটি অ্যাক্ট-২০০৬। ২০০৯-এ তা সংশোধিত হয়। এছাড়া ২০১০ সালে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১০-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। উপরোলি-খিত আইনগুলো সাইবারক্রাইম প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭০ লাখের মতো কমপিউটার ব্যবহারকারী রয়েছে। প্রায় ৫ লাখের মতো মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। উপরোলি-খিত ব্যবহারকারীরা প্রত্যেকেই কমপক্ষে একবার হলেও সাইবারক্রাইমের শিকার হয়েছেন।

এছাড়া ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, মন্ত্রী, সরকারি ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওয়েবসাইটগুলোও হ্যাক করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকা উন্নত বিশ্বের সাইবার ক্রাইমের চেয়ে আমাদের দেশের ক্রাইমগুলো একটু ভিন্ন ধাঁচের। বাংলাদেশের সাইবার-ক্রাইমে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে সামাজিক অবক্ষয়ের মাত্রাই বেশি। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে নারী ও শিশুরা। ►

**কেস স্টাডি :** ঢাকার নামকরা একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ প্রথম বর্ষের ছাত্রী ইরা (কাল্পনিক নাম)। বরিশাল থেকে আসা মেয়েটি ফার্মগেটের ছাত্রী হোস্টেলে থাকে। স্কুল-কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বরাবরই প্রথম হতো। ঢাকায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরপরই মিডিয়াতে কাজ করার প্রবল ইচ্ছা জাগে। একদিন ম্যাগাজিনে অ্যাড ফার্মের ছোট বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করে বিস্তারিত জেনে নেয়। ফোনের কথোপকথনের দুইদিন পর নয়াপল্টন বিজ্ঞাপনের অফিসে যায়। ফার্মের ম্যানেজার প্রথম দেখাতেই ইরাকে একটি সাবানের বিজ্ঞাপনের জন্য সিলেক্ট করে। স্ক্রিন টেস্টের জন্য ফটোসেশন হবে এই বলে ম্যানেজার তাকে দুইদিন পর আসতে বলেন। দুইদিন পর ইরা ফটোসেশনের জন্য গেলে সেখানে ইরার মতো আরো কয়েকজন মেয়ে ফটোসেশনে অংশ নেয়। অফিসের সাজসজ্জা, ম্যানেজারের আচার, আচরণ দেখে ইরা মনে মনে ভাবে খুব শিগগিরই মনের আশা পূরণ হচ্ছে। ঘটনার তিনদিনের মাথায় অ্যাড ফার্ম থেকে ইরাকে ফোন করে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে দেখা করতে বলা হয়। টাকা নিয়ে দেখা না করলে তার ছবিগুলো সুপার ইম্পোজ করে পর্নোসাইটে পোস্ট করে দেয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। ইরার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। কারও সাথে বিষয়টি শেয়ারও করতে পারছে না। অ্যাড ফার্মের ফোনে কাকুতি করে অনুনয়-বিনয় করেও লাভ হয়নি। শেষে উপায় না দেখে প্রবাসী বড় ভাইয়ের দেয়া স্বর্ণের চেইন ও কানের দুল বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ, ছবিগুলো ইন্টারনেটে পোস্ট করলে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিস্টার ফি দিতে হবে এই বলে রুমমেটের মায়ের কাছে ৩৮ হাজার টাকায় তার স্বর্ণ বিক্রি করে অ্যাড ফার্মের টাকা দেয়। টাকা দেয়ার বদলে ম্যানেজার ইরাকে তার সব ছবি ফেরত দেয়। সফট কপি ফেরত চাইলে তাকে জানানো হয় সেগুলো কম্পিউটার থেকে মুছে গেছে। অগত্যা প্রিন্টেড ছবি নিয়েই হোস্টেলে ফেরে। কিন্তু তবু তার পিছু ছাড়ে না। মাসখানেক পর আবার পিশাচ ম্যানেজার ফোনে ইরাকে জানায় তার কুপ্রস্তাবে রাজি না হলে তাকে ফাঁসিয়ে দেয়া হবে।



এই দ্বিতীয় ঘটনার পর ইরা মানসিকভাবে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে। সবার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। কয়েক দিন ইরার ফোন বন্ধ পেয়ে বরিশাল থেকে ঢাকায় ছুটে আসেন বাবা এবং বড় ভাই। অসুস্থ ইরা বড় ভাইকে সব ঘটনা খুলে বলেন। ইরার বড় ভাই পরিচিত এক মানবাধিকার কর্মী ও পুলিশের সহায়তা নিয়ে অ্যাড ফার্মের ম্যানেজারকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয় এবং ছবির সফট কপিগুলো উদ্ধার করে। এভাবে একজন ইরা অভিভাবকের বুদ্ধিমত্তার কারণে মানসম্মান বাঁচাতে পেরেছে। কিন্তু এমন শত শত ইরা না বুঝে সাইবারক্রাইমে পা দিয়ে অন্ধকার জীবনে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আবার অনেকে বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ।

সাইবারক্রাইমের আরেকটি নিরাপদ স্থান হলো ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা সাইবারক্যাফে। সাধারণত স্কুল-কলেজের আশপাশে ছোট একটি কামরা নিয়ে ৫-৭টি কম্পিউটারকে হার্ডবোর্ড দিয়ে বর্গাকার করে শুরু করে দেয় ব্যবসায়। এসব ব্যবসায়ীর নেই কোনো লাইসেন্স, নেই কোনো তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান। সাধারণত স্কুল-কলেজ চলার সময় কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা হর এখানে এসে ভিডিও গেমস খেলে, না হয় পর্নোসাইটে মত্ত থাকে। ছেলেমেয়েদের একটি অংশ আবার শুধু ডেটিং করার জন্য এখানে আসে। অসাধু ক্যাফে মালিক সুযোগ বুঝে গোপন ক্যামেরায় ধারণ করে জুটিদের কার্যকলাপ। পরে রেজিস্টার দেখে তাদের মোবাইলে ঘটনা বর্ণনা করে চাঁদা চাওয়া হয়। র‍্যাবের ভিজি মোখলেসুর রহমান এ সম্পর্কে বলেন— অচিরেই এসব সাইবারক্যাফের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে। বিশেষ করে রেজিস্ট্রেশনবিহীন ক্যাফের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। কারণ, এগুলোই অনেক সাইবারক্রাইমের উৎস।

'সাইবারক্যাফে ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রেসিডেন্ট নাজমুল করিম একটি পত্রিকার বরাত দিয়ে বলেন, সারাদেশে ৪,৫০০-এরও বেশি সাইবারক্যাফে রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ২৫০টি ক্যাফের বিটিআরসির অনুমোদন রয়েছে। বাকি সব অবৈধ। এসব অবৈধ সাইবারক্যাফেগুলোতে ছোটখাটো অনেক সাইবারক্রাইম হয়ে থাকে। বিটিআরসির সিগন্যাল অ্যান্ড লাইসেন্সিং বিভাগের ভিজি একেএম শহিদুজ্জামান মাত্র ২৫০টি ক্যাফের রেজিস্ট্রেশনের কথাই স্বীকার করেছেন।

বাংলাদেশে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ফেসবুক ব্যবহারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছে। আগস্ট ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০ লাখ ইউজার ছিল ফেসবুকে। বর্তমানে আরো বেড়েছে। ইউজার বাড়ার সাথে সাথে ফেসবুকে প্রতারণার সংখ্যাও বেড়ে চলছে। অনেকেই নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করে প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে। ফেসবুকের মাধ্যমে একদিকে যেমন সামাজিক যোগাযোগ বাড়ছে, অন্যদিকে বাড়ছে সামাজিক অস্থিরতা। ২০১০ সালের অক্টোবরে আমেরিকান একাডেমি অব ম্যাট্রিমোনিয়াল ল ইয়ারস-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সাইটগুলোর কারণে যুক্তরাষ্ট্রে বিবাহ বিচ্ছেদের হার অনেক বেড়েছে।

**আইসিটি অ্যাক্ট ২০০৬ অধীনে প্রথম মামলা:** ঢাকার গার্হস্থ্য অর্থনীতির স্নাতক শ্রেণীর এক ছাত্রীর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সূত্রে সঞ্জয় দে গুরুকে রিপন নামের এক যুবকের পরিচয় হয়। পরে রিপন তাকে রেজা নামে একজনের সাথে পরিচয় করে দেয়। ঘটনার পরিক্রমায় রিপন এবং রেজা মেয়েটিকে একটি জাতীয় দৈনিকের প্রকাশনায় চাকরি দেয়ার জন্য নিয়ে যায়। গত জুন থেকে ওই প্রকাশনায় সে চাকরি করতে থাকে। এক সময় সুযোগ বুঝে সঞ্জয় তাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি তার প্রস্তাব বারবার প্রত্যাখ্যান করার পর থেকে দুই বন্ধু মিলে বিভিন্ন সময়ে তার ছবি তোলে। পরে সেই ছবি বিকৃত করে ফেসবুকে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে পোস্ট করে দেয়। এখানে রেজাকে তার স্বামী হিসেবে দেখানো হয়। মেয়েটি চাকরি ছেড়ে দেয়ার পরও তাকে এবং তার পরিবারকে চাঁদা চেয়ে হুমকি দেয়া হয়। এমনকি মেয়েটির ফেসবুকের ছবি দেখিয়ে মেয়েটির বিয়ে ভেঙে দেয়া হয়।

কিন্তু আশার কথা এই যে, সাহসী মেয়েটি গত ৩০ নভেম্বর ২০১০ ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে আইসিটি অ্যাক্ট ২০০৬-এর অধীনে মামলা ঠুকে দেন। মহানগর হাকিম একেএম এমদাদুল হক আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ সালের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য গোয়েন্দা পুলিশকে নির্দেশ দেন। বাদিনীর আইনজীবী তুষার রায় বলেন, অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে আইসিটি অ্যাক্ট ২০০৬-এর ৫৭ এবং ৬৬ ধারায় মামলা হয়েছে।

ধারা ৫৭ : যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করে যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতি ভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইনশৃংখলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতির আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উসকানি প্রদান করা হয় তাহা হইলে তার এই কার্য হবে একটি অপরাধ।

কোনো ব্যক্তি উপধারা (১)-এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক দশ বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ৬৬ : যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কম্পিউটার ই-মেইল বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে রিসোর্স বা সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংগঠনে সহায়তা করেন তাহা হইলে তাহার উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ।

বাংলাদেশে সাইবারক্রাইমের আরেকটি ভয়ঙ্কর উপাদান হলো পর্নোগ্রাফ সিডি। হাত বাড়ালেই রাস্তায় সস্তায় এসব সিডি মেলে। টিনেজ বয়সের ছেলেমেয়েদের এসব কুরুচি পর্নো সিডি বিপথগামী করে তুলছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকাতেও এগুলো খুব সস্তাতেই পাওয়া যায়। পুলিশ ও র‍্যাব মাঝে মাঝে এই চক্রটিকে ধরে নিলেও আইনের ফাঁকফোকরে বেরিয়ে এসে আবার ব্যবসায় শুরু করে।

## পর্নো সাইট বন্ধে পুলিশের উদ্যোগ

বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের ক্রাইম ইউনিট বাংলাদেশের ৮৪টি পর্নো ওয়েবসাইট চিহ্নিত করে এগুলো বন্ধের জন্য বিটিআরসিকে অনুরোধ করে। পুলিশ সদর দফতরের মিডিয়া বিভাগের এআইজি নজরুল ইসলাম দীর্ঘদিন বিশ্লেষণ করে বলেন, মাত্র ▸

৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ২০টি পর্নো ডাউনলোড হচ্ছে। তাহলে প্রতিদিন ৮৪টি সাইট থেকে কত পরিমাণ ডাউনলোড হয় তা সহজেই অনুমেয়। এদিকে বিটিআরসি বলছে, তাদের একার পক্ষে সাইটগুলো বন্ধ করা সম্ভব নয়। সাইটগুলো বন্ধ করতে হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা প্রয়োজন। মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসির রশি টানাটানি যতই দীর্ঘায়িত হবে, ক্রাইম ততই বাড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন। সরকার পর্নোগ্রাফি আইনের একটি খসড়া তৈরি করেছে, যা পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১০ নামে অভিহিত হবে। পুলিশের অপরাধ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই আইন কার্যকর করা হলে সাইবার-ক্রাইম অনেকাংশে কমে যাবে।

## প্রস্তাবিত আইনে যা থাকছে

পর্নোগ্রাফি অর্থ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে যৌনোদ্দীপনা সৃষ্টি, ব্যক্তির ইমেজ বা মর্যাদা বিনষ্ট করার লক্ষ্যে বা অন্যায়ভাবে কেউ লাভবান হওয়া বা কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা অশ্লীল চিত্র, ভিডিও ক্লিপসে অশ্লীল সংলাপ প্রকাশনা, পুরুষ বা নারীর নৃত্য নগ্ন, অর্ধনগ্ন, চলচ্চিত্র বা ভিডিও চিত্র তৈরি এ আইনের আওতায় পড়বে। এসব পর্নোসিডি উৎপাদন সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, বহন, আমদানি, রফতানি সরবরাহ, কেনাবেচা, প্রদর্শন এ অপরাধের আওতায় পড়বে। এছাড়া কারো ওয়েবসাইট হ্যাকড করা, কারো পাসওয়ার্ড চুরি করাও এই আইনের আওতায় পড়বে। এছাড়া কারো ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ঢুকে নগ্ন ছবি ডাউনলোড ও স্ট্যাটাস দিলেও অপরাধের মধ্যে শামিল হবে।

পর্নোগ্রাফি অপরাধের আইন দ্রুত বিচার আইন-২০০২-এর ধারা এর সংজ্ঞা অনুযায়ী গঠিত ট্রাইব্যুনালে অনুষ্ঠিত হবে। গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির ৭ দিনের মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা সম্ভব না হলে আদালত একটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেবে। হাজির না হলে তার অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য সম্পন্ন হবে।

উপরোল্লিখিত আইনে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ৫ বছর সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সাইবারক্রাইম ঘটে সেলুলার ফোন বা মোবাইল ফোনে। কারণ, ব্যবহারকারীকে শনাক্ত করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এছাড়া সস্তায় ক্যামেরা বা ভিডিও ফোন বাজারে পাওয়া যায়। খুব সহজেই অন্যের অজান্তে ভিডিও করা ফটো তুলে সহজে পড়া যায়। কিছুদিন পূর্বে বিটিআরসি ১৮ বছরের নিচে এবং জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট ছবি ও অন্যান্য কাগজপত্র ছাড়া বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে। বাংলাদেশ পুলিশের ক্রাইম বিভাগ থেকে জানা যায়, শুধু ২০১০ সালেই প্রায় ১১ হাজার মোবাইল গ্রাহকের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে জমা পড়েছে। তদন্তের পর পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ প্রায় ৫ হাজার সিম বন্ধ করে দিয়েছে। ডিএমপির একজন সাইবারক্রাইম ইনভেস্টিগেশন অফিসারের বরাতে জানা যায়, প্রতিদিনই মোবাইলের প্রতারণার অভিযোগ জমা পড়ছে। তিনি জানান, পর্যায়ক্রমে সবগুলোর তদন্ত করা হবে।

সরকারি, বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট দখল : আমরা যখন ভিশন-২০২১ নিয়ে গলা ফাটাচ্ছি, তখন সাইবার-ক্রিমিনালরা একের পর এক সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ সাইটগুলো হ্যাক করে যাচ্ছে, যা আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতিও হুমকি।

২০১০ সালের ২১ মার্চ বাংলাদেশের ১৯টি জেলার ওয়েবপোর্টাল হ্যাক করা হয়েছিল। ধারণা করা হয়, হ্যাকাররা সবাই ভারতের।

২৩ জুন ২০০৯ সালে র‌্যাব জেএমবির সাইবার বিশেষজ্ঞ রাজিবকে আটক করে। রাজিব জানায় বিস্ফোরকসংক্রান্ত বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তা বাংলায় অনুবাদ করে বোমাবিশেষজ্ঞ সিফাত এবং বাসারকে সরবরাহ করে তারা সূত্রগুলো বোমা বানাতে কাজে লাগায়।

বর্তমানে বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে টালমাটাল অবস্থা বিরাজ করছে। এর পেছনেও রয়েছে সাইবার-ক্রিমিনাল চক্র। কিছুদিন আগে একটি বেসরকারি ব্যাংকের ব্রোকারেজ কর্মকর্তা মাহবুব সরোয়ার তার অবৈধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যম হিসেবে ফেসবুককে বেছে নেন। তিনি ফেসবুকে একটি বিরাট চক্র তৈরি করেন। এই চক্রটিকে তিনি কখন শেয়ার ছাড়তে হবে বা কিনতে হবে তা পরামর্শ দিতেন। তিনি এভাবে গোপন পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে অনেককে পথে বসিয়ে নিজে কামিয়েছেন শত শত কোটি টাকা।

কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ওয়েবসাইট হ্যাকড করা হয়েছিল। বাসসের ওয়েবসাইটে ক্লিক করলে এমইজিও মেঘো নামটি চলে আসত।

২০০৪ সালের ২৩ আগস্টে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে ই-মেইলে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। এ ঘটনায় পার্থ সাহা নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনার পরিক্রমায় প্রমাণিত হয়, পার্থ সাহা নয়, জঙ্গি সদস্য মুরসালিন ও মুত্তাকিন নামে দুজন দুষ্কৃতকারী তাকে হুমকি দিয়েছিল।

বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী জিএম কাদেরকে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১০ সালে কয়েক দফায় হুমকি দেয়া হয়। এখানে মাধ্যম ছিল মোবাইল ফোন। তার ২ দিন পর আবারো তাকে এসএমএস পাঠিয়ে হত্যার হুমকি দেয়া হয়।

গত ২৯ মে ২০১০ সালে মাহবুব আলম রডিন নামে এক ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রীর ব্যঙ্গাত্মক ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে দেয়। পরে র‌্যাব তাকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ফেসবুক ২ দিনের জন্য বন্ধও রাখা হয়।

## আইসিটি অ্যাক্টের দুর্বলতা ও সরকারের করণীয়

সাইবারক্রাইম প্রতিরোধে সরকারের প্রণীত আইসিটি অ্যাক্ট ২০০৬ (কিছু ধারা সংশোধিত ২০০৯) অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এখানে কিছু দুর্বলতা রয়ে গেছে। যেমন- অ্যাক্টের প্রথমেই উল্লেখ আছে- 'সমগ্র বাংলাদেশে ইহা প্রযোজ্য হইবে'। তাহলে বাংলাদেশের বাইরে বসে যারা অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করবে বা অপরাধ করবে তাহলে তাদের বিচার কিভাবে করা হবে? এখানে সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছর এবং আর্থিক দণ্ড সর্বোচ্চ এক কোটি টাকার বিধান করা হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্রাইম ১০ বছরের শাস্তি বা ১ কোটি টাকাকেও ছাড়িয়ে যায়। ধরা যাক, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যদি অপপ্রচার বা অন্যায় কোনো তথ্য পোস্ট বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো রাষ্ট্রীয় দলিল অনলাইনের মাধ্যমে পাচার করে, তবে তা সামান্য শাস্তি দিয়ে পূরণ করা যাবে না। আবার আমাদের সংবিধানের আর্টিকেল ১৯-এ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গত ৩০ মে ২০১০ সালে ফেসবুক প্রায় ২ দিনের জন্য বন্ধ ছিল। এখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়েছে। আরাফাত হোসেন খান নামে বাংলাদেশের এক তরুণ ব্যারিস্টার গত ৬ জুন ২০১০ সালে ফেসবুক বন্ধ থাকার জন্য আইসিটি অ্যাক্ট ২০০৬-এর ৪৬-এর ৫৭ ধারার বিরুদ্ধে আদালতে রিট করেন। তিনি মনে করেন, এতে ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। তিনি সংবিধানের ৩৮ ও ৩৯ আর্টিকেলে 'ফ্রিডম অব ইনফরমেশন'-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, সার্বভৌমত্বের হুমকি ছাড়া এভাবে ফেসবুক বন্ধ করা ঠিক হয়নি। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, বর্তমানে প্রচলিত আইনটি ইউনাইটেড নেশনস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ল (ইউএনসিআইটিএল)-এর সাথে সঙ্গতি রেখে করা উচিত ছিল, যাতে আইনটি বর্তমান বিশ্বায়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। কারণ সাইবারক্রাইম পৃথিবীর যেকোনো স্থানে বসে করা যাবে। অন্যদিকে ইউএনসিআইটিএল আইনটি সারা পৃথিবীর জন্যই করা হয়েছিল। বাংলাদেশ ইন্টারপোলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সাইবারক্রাইম প্রতিরোধ করার জন্য ইন্টারপোল গঠন করেছে 'এশিয়া সাউথ প্যাসিফিক ওয়ার্কিং অন ইনফরমেশন টেকনোলজি ক্রাইম', যার সদস্য সংখ্যা ৪৬। এসব দেশের সাথে সমন্বয় সাধন করে যদি সাইবারক্রাইম আইনটিকে আরো যুগোপযোগী করা যায়, তবে আইনটির কার্যকারিতা অনেক বাড়বে।

উপরোল্লিখিত সাইবারক্রাইমের ঘটনা ও দুর্বলতাগুলো যদি আমরা কাটিয়ে উঠতে না পারি, তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার কাগজে কলমেই রয়ে যাবে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করার পূর্বশর্তই হচ্ছে, দেশের তথ্যপ্রযুক্তিকে আরও নিরাপত্তা বলয়ে রাখা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সাইবার-নিরাপত্তাবিষয়ক যথাযথ ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণে এবং সামাজিকভাবে সাইবারক্রাইমের বিরুদ্ধে গণসচেতনতাই হতে পারে প্রকৃত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার দৃঢ়অঙ্গীকার।

ফিডব্যাক : ferdoushdvaga77@yahoo.com